ক্যাম্পাস

অন্য চোখে দেখা ক্যাম্পাস

০৯ জুন ২০১৯, ১৩:০৯

অন্য চোখে চেনা ক্যাম্পাসকে দেখার আহ্বান জানিয়েছিল স্বপ্ন নিয়ে। শিক্ষার্থীদের পাঠানো লেখা থেকে বাছাই করা কয়েকটি লেখা নিয়ে এই বিশেষ আয়োজন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ঝুলন্ত সেতুচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাস ক্যানভাস

নুসরাত শারমিন

বেগুনি জারুল ফুলের চাদর, লাল কৃষ্ণচূড়ার শামিয়ানা, বর্ষায় ছোট ছোট বাচ্চাদের হাতে থোকায় থোকায় কদম ফুল, শরতের শুভ্র কাশফুলের আবরণে ঢাকা সবুজ পাহাড় কিংবা শিউলিতলা। প্রকৃতির সব রূপ-রঙের বদল চোখে পড়বে এখানেই; ছোট-বড় সবুজ পাহাড় আর বন দিয়ে সাজানো হাজারো শিক্ষার্থীর প্রাণের ক্যাম্পাস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে।

সকালের শাটল ট্রেন দিয়ে শুরু হওয়া ব্যস্ততা শেষও হয় রাতের শাটলেই। এই শাটলই ক্যাম্পাসের প্রাণ। প্রতিদিন শহর থেকে হাজারো তরুণ প্রাণ ক্যাম্পাসে পদার্পণ করে। গান-আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু এই শাটল। চিৎকার করে ‘এমন যদি হতো’, ‘বকুল ফুল’, ‘সেই তুমি কেন এত অচেনা হলে’, ‘তোমার জন্য নীলচে তারায়’...এসব গান গাওয়ার জন্যই যেন শাটল তৈরি হয়েছিল। একবার শীতের শেষ দিকে শাটল থেকে সূর্যাস্ত দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। শেষ বিকেলে ট্রেনের বগিতে শিক্ষার্থীদের কণ্ঠে সঞ্জীব চৌধুরীর ‘আমি তোমাকেই বলে দেব’ গান, আর সঙ্গে ধীরে ধীরে ডুবতে থাকা লাল-কমলা সূর্য স্মৃতির পাতায় অজান্তেই একটা মধুর সময়কে বন্দী করেছিল।

যারা প্রকৃতি ভালোবাসে, প্রকৃতির কাছাকাছি থাকতে চায়, প্রতিমুহূর্তে প্রকৃতির রূপ তারা আস্বাদন করতে পারবে এখানেই। সেটা হোক শাটল থেকে শুভ্র কাশফুলের ওপর হাত ছোঁয়ানো মুহূর্ত, হোক সেন্ট্রাল ফিল্ডের সবুজ মাঠে হাজারো পাখির কিচিরমিচির শব্দের মাঝে বসে সূর্যাস্ত দেখা কিংবা ফরেস্ট্রিতে পিচঢালা রাস্তায় বৃষ্টির পর ঝরে পড়া সবুজ পাতার হরেক রকম রূপ দেখা! পুরো ক্যাম্পাসটাই সৌন্দর্যে বুঁদ হয়ে আছে। কলার ঝুপড়ি, লেডিস ঝুপড়ির হইচই, শহীদ মিনারে গিটারের টুংটাং, কাটা পাহাড়ের রাস্তায় সোডিয়াম লাইটগুলোর মায়াবী আলো, সুনামি গার্ডেনে আড্ডা, ঝুলন্ত সেতু, মউয়ের দোকানের ভিড়, সবুজ ফরেস্ট্রি এবং ঝুলন্ত সাঁকো, দোলা সরণি, বোটানিক্যাল গার্ডেন, গোলপুকুর-বায়োলজির পুকুরপাড়, হতাশার মোড়, অত্যাধুনিক ল ফ্যাকাল্টি, সবুজ সেন্ট্রাল ফিল্ড, ভূতের বাড়ি, পামবাগান, জারুলতলা, মুক্তমঞ্চ, বুদ্ধিজীবী চত্বর, কলা ফ্যাকাল্টির পেছনের ঝরনা, রোমাঞ্চকর চালন্দা গিরিপথ—সবকিছুতেই মুগ্ধতা ছড়িয়ে রয়েছে।

নিত্যনতুন উৎসব-অনুষ্ঠানে ক্যাম্পাস সব সময় মুখরিত থাকেই। তবু এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব পয়লা বৈশাখ। ১৪ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে

মানুষের এত ভিড় হয় যে এত বড় ক্যাম্পাসেও হাঁটার তিল পরিমাণ জায়গা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। আমার প্রিয় ক্লাস ছিল করিম স্যারের স্ট্যাটিসটিকস ক্লাস। এক দিনের জন্যও মিস দিইনি। কিন্তু একবার দেরি করে ক্লাসে গিয়েছিলাম। স্যার খুব মধুরভাবে হেসে বলেছিলেন, ‘ওয়েলকাম, ওয়েলকাম’। স্যারের ক্লাসে কেউ দেরি করে গেলেও স্যার তাকে ক্লাসে ঢোকার অনুমতি দিতেন এবং বলতেন ‘ওয়েলকাম’। তাঁর মতে, একেবারে না আসার চেয়ে দেরি করে আসা ভালো।

দ্বিতীয় বর্ষের আরেকটা ক্লাস খুব স্মরণীয়। সেটা হলো আতিক স্যারের ‘গল্পের বইয়ের ক্লাস’। সেদিনের ক্লাসে স্যার সবাইকে যার যার প্রিয় গল্পের বইয়ের নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন। ক্যাম্পাসে যে ঘটনা মনে দাগ কেটে দিয়েছে সেটা হলো—একবার এক আপুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনি হলে ওঠেন না কেন?’ আপু উত্তর দিয়েছিলেন, ‘দেখো, এখানে সবার অর্থনৈতিক অবস্থা সমান নয়। অনেকের পরিবার তাদের মেয়েদের কোনো রকম সাহায্যই করতে পারে না। খুব কাছে গেলে দেখতে পারবে, কতটা সংগ্রাম করে ওরা। বিলাসিতার কোনো ছোঁয়াই নেই তাদের জীবনে। আমি হলে সিট পাব আমি জানি। আমি না উঠলে আমার সিটে কে উঠবে, তা আমি জানি না। হয়তো খুব সাধারণ কেউ সুযোগ পাবে। সেই সাধারণ কেউয়ের জন্য আমি হলে উঠছি না। আমার চেয়ে হলের সিট তার বেশি দরকার।’

কে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা শুধু ক্লাসরুমই শিখি? পুরো ক্যাম্পাসই আমাদের ক্লাসরুম।

তৃতীয় বর্ষ, ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

কাঠগোলাপের সাদার মায়া

সৃষ্টি বৈদ্য

ক্যাম্পাস বলতে আমরা শুধু ক্যাম্পাস বুঝি না, বুঝি এমন এক অনুভূতিকে যাকে কোনো শব্দ দিয়েই সংজ্ঞায়িত করা যায় না। জীবনের কোনো ওয়ার্মআপ নেই,

প্র্যাকটিস রাউন্ড নেই, কোনো রিসেট বাটনও নেই। প্রতিদিন আমরা একটু একটু করে জীবনের গল্পে কয়েকটি শব্দ যোগ করে চলেছি মাত্র। অমলকান্তির মতো আমিও চাইতাম রোদ্দুর হতে। কিন্তু এই মুমূর্ষু ইচ্ছাটাকে বাঁচিয়ে তুলল আমার ক্যাম্পাস।

আমার ক্যাম্পাস আমার স্বর্গ। ক্যাম্পাসের সবচেয়ে চেনা যে জায়গায় চিন্তাগুলো নিশ্চিন্তে যাপন করে, সেটি আমার হল। নওয়াব ফয়জুন্নেসা হল। সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে ছোট। হলের সবচেয়ে প্রাচীনতম তরুণ যে গাছ, সেটি হলো বহু পুরোনো এক কাঠগোলাপ। এই কাঠগোলাপগাছের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলোর রং কখনো ‘সেপিয়া’ হবে না, হবে সবচেয়ে জীবন্ত, প্রাণচাঞ্চল্যকর। এই কাঠগোলাপগাছ ঘিরে বেড়ে ওঠা স্মৃতিগুলো একান্ত নিজের। সাদার মায়ায় সবাইকে আচ্ছন্ন করে রাখে, মন খারাপের অংশীদার হয়, অংশীদার হয় ভালোবাসার। আর সবুজের ওপর কাঠগোলাপগুলোকে রোদ পোহাতে দেখলে আমার বড্ড হিংসে হয়...আমি বসে থাকি কাঠগোলাপগাছের নিচে রোদ্দুর হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কাঠগোলাপগুলো আমার দিকে তাকিয়ে হয়তো মুচকি হাসে, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি বসেই থাকি, রোদ্দুর হওয়ার ভান করি।

দ্বিতীয় বর্ষ, চারুকলা বিভাগ

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষ্ণচূড়াকুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃষ্ণচূড়ার কথা

সানজিদা আনোয়ার

যত দূর মনে পড়ে, আম্মু আমাকে ছোটবেলায় একটা কৃষ্ণচূড়াগাছ দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আমরা ছোটবেলায় এই ফুলের পাপড়ি নিয়ে তার ওপর কলমের ছিপের গোল অংশটার ছাপ বসিয়ে লাল টিপ বানাতাম। তারপর কপালে লাগাতাম।' আম্মুর পছন্দের কারণে হোক, বা যে কারণেই হোক, এরপর থেকে কৃষ্ণচূড়া আমারও বেশ প্রিয় একটা ফুল হয়ে গেল।

আমার প্রিয় ক্যাম্পাস। একেকটা ঋতুতে তার রূপ একেক রকমভাবে রং বদলায়। গ্রীষ্মকালে যখন কৃষ্ণচূড়ার লালে পুরো ক্যাম্পাসটা ছেয়ে যায়, বারবার তার প্রেমে পড়ে যাই। আনমনে ডিপার্টমেন্টের করিডর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেও চোখ চলে যায় অনুষদের কৃষ্ণচূড়াগাছটার দিকে। কিংবা তাড়াহুড়া করে অনুষদে উঠতে গিয়েও হাঁটার গতি ধীর হয়ে আসে, যখন সেই কৃষ্ণচূড়ার পাশ দিয়ে যাই। চোখ আটকে যায় লাল শামিয়ানার মতো পাতানো ছড়িয়ে থাকা কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলোর দিকে। কিংবা সময় পেলেই টুক করে তুলে ফেলি সেই কৃষ্ণচূড়াগাছের কয়েকটা ছবি। যতবারই গাছটার পাশ দিয়ে হাঁটি, আম্মুর সেই কথাটা মনে পড়ে যায়। পরিবার–পরিজন থেকে এত দূরে থাকায় যে জিনিসটা বারবার আমার মায়ের কথা মনে করিয়ে দেয়, হয়তো সে কারণেই এই গাছটার প্রতি এত মায়া আমার। পূর্ণ শীতে গাছটা যখন শূন্য ডালপালা নিয়ে নিঃস্ব হয়ে থাকে, আমার হৃদয়টাও খালি খালি লাগে তখন। একটা গাছের প্রতি এতটাই টান কাজ করে। আমি আশায় থাকি, আবার বৈশাখ আসবে, আবার আমি মুগ্ধতায় নয়ন জুড়াব।

চতুর্থ বর্ষ, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ

ব্রিটিশ ভাই নামে সবার কাছে পরিচিত তিনি

হাজি মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ব্রিটিশ ভাই

মো. শাহরিয়ার হক

ওরিয়েন্টেশন, অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি অনুষ্ঠানের দিনে সকালে ক্যাম্পাসে পৌঁছে এক বড় ভাইয়ের সঙ্গে নাশতা করতে গেছি। সেখানে যে মানুষটা প্রথম মনে দাগ কাটেন, তিনি ব্রিটিশ ভাই।

ব্রিটিশ ভাই—এ আবার কেমন নাম! নামটা শোনার পর আমার মনেও প্রথমেই এই প্রশ্ন জেগেছিল।

ক্যাম্পাসের সামনে এক রেস্তোরাঁর বেয়ারা বা বলা যায় সিনিয়র বেয়ারা তিনি। প্রতিবছর আমাদের ক্যাম্পাসে যে গোটা পঞ্চাশেক বিদেশি ছাত্রছাত্রী আসে, তাদের সঙ্গে টুকটাক আলাপ করে খাবারের অর্ডার নেন তিনি। ইংরেজি ভাষায় দিব্যি বিদেশি ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা চালিয়ে নিতে পারেন। আর এ জন্যই তিনি আমাদের ব্রিটিশ ভাই।

মুখে সব সময় একফালি হাসি নিয়ে রেস্তোরাঁজুড়ে দৌড়ে বেড়ান। আতিথেয়তা পাওয়ার সুযোগ হলে, এই ফুরফুরে মেজাজের মানুষটার জন্য আপনার মেজাজও ফুরফুরে হয়ে যাবে।

ও হ্যাঁ, ভাইয়ের আসল নাম মো. এহছানুল হক। এই লেখাটা লিখতে বসার কদিন আগেও তথ্যটা জানা ছিল না। আমাদের কাছে তিনি শুধু ব্রিটিশ ভাই নামেই পরিচিত ছিলেন।

দ্বিতীয় সেমিস্টার, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ

এই সিঁড়ি কখনো দল বেঁধে ছবি তোলার জায়গাঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সিঁড়ি

তাহমিদ উল ইসলাম

কখনো প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কলতানে মুখর, কখনোবা দল বেঁধে ছবি তোলার জায়গা, কখনো কখনো প্রেমের খুনসুটি, সময়ে সময়ে মিয়া শোভন ভাইকে দেখা যায় বই নিয়ে বসে থাকতে, উৎসবে চোখে পড়ে ভিন্ন সাজ, ইদানীং দেখলাম টেরাকোটার কাজও হয়েছে। বলছিলাম সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সিঁড়ির কথা। বেশির ভাগ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের দোতলার ফটকটি বন্ধই থাকে। কিন্তু এই সিঁড়িতে আড্ডা দেওয়ায় ছেদ পড়ে না সে জন্য। চা কিংবা কফি হাতে বসে গল্প করার জন্য জুতসই একটা জায়গা। ঋতুতে ঋতুতে যেন রূপবদল ঘটে

তার। শীতে মিষ্টি রোদ পোহানো যায় মহা আনন্দে। বসন্তে বা গ্রীষ্মে হাওয়া বয় প্রচুর। আর এই সিঁড়িতে আশ্রয় নিয়ে বর্ষা দেখা? সে তো এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। অ্যাসাইনমেন্ট বা গ্রুপ ওয়ার্কের জন্য সেমিনারে জায়গা না হলে চলে আসাই যায় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সামনের এই রাজকীয় সিঁড়িটিতে। আমরা সোশিওলজি রিডিং ক্লাব থেকে তো পাঠচক্রেরও আয়োজন করেছি এই সিঁড়িতেই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি দেড় বছর, কিন্তু এই দেড় বছরেই একরাশ স্মৃতি জমা হয়েছে এই জায়গাটিকে ঘিরে। কত স্বপ্ন বুনেছি, গল্প করেছি, গান গেয়েছি এই একটি জায়গায় বসে! বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শেষে যখন ক্যাম্পাসে আসব, নিশ্চয়ই এই সিঁড়ি অনেক স্মৃতির ঝাঁপি খুলে দেবে।

দ্বিতীয় বর্ষ, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

রুয়েটের ক্যাম্পাস আপন করে নিয়েছে ইত্তিলাকেরাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যানটিনের গল্পসমগ্র

ইত্তিলা ইসলাম

২৭১ কিলোমিটার দূরের পথ পেরিয়ে এসে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনকে রূপকথার গল্পের মতো পাব বলেই ভেবেছিলাম। ১৯ বছরের একটা মেয়ে সবকিছু আপন করে নেওয়ার

জন্য ছুটেছিল যেখানে, সেখানে পৌঁছে পরিবার, পুরোনো বন্ধু, আগের অভ্যাসগুলোর সামনে নতুন জগতের সবকিছুই বেমানান লাগতে শুরু করল। সব জায়গায় অপাঙ্‌ক্তেয় হয়ে গেলাম।

প্রথম দিকের ছয় মাস যখন সবাই নিজেরা নিজেদের বানানো গ্রুপে হইহুল্লোড় করে বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের শুরুটা স্মৃতিময় করে রাখায় ব্যস্ত ছিল, আমি তখন যেন বিশাল মরুভূমিতে মরীচিকার মতো বিভ্রমে বারবার পড়ে যেতে লাগলাম। ১৫২ একরের ক্যাম্পাস, দেবদারু, মাঠ, টংয়ের আড্ডা, ক্লাস—কিছুই আমাকে টানল না একবারও। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে খুঁজতাম একটু আপন জায়গা, যেখানে আমার আর একা লাগবে না! কতজনকে কতভাবেই না সময়গুলো কাটাতে দেখতাম। কেউ হয়তো বঙ্গবন্ধু হলের সামনে টংয়ে বসে চায়ের কাপের ধোঁয়ায় ১০ বছর পরের জীবনকে দেখছে, কেউ সেলিমের সামনের বেঞ্চগুলোয় বসে প্রেমে পড়বে না বলে শপথ নিচ্ছে, কেউ কেউ শহীদ মিনারের আড্ডায় সুর দিচ্ছে...বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে সবাই আলাদা রাজ্য গড়ে তোলে। কেউ একাই ভালো থাকতে চায়, আবার অনেকে অনেকের কাছে দশজনের আড্ডায় মুখর থাকা মানেই ভালো থাকা।

অচেনা ক্যাম্পাস, অচেনা মুখের ভারে যখন হতাশ হয়ে যেতে লাগলাম, তখনকার কোনো এক দুপুরে একটা রাজ্য পেয়েই গেলাম। ক্যানটিন। চার দেয়ালের মধ্যে কিছু টেবিল-চেয়ার, ব্যস্ত পদচারণ—এইটুকুই যা শুধু দেখা যায়। কিছু কিছু গল্প যা টেবিল-চেয়ার এমনকি জানালার পাল্লাগুলোর স্মৃতিতেও থেকে যায়। সেসব সবাই জানে না। ওই দিন খাবার নিয়ে বসতেই পেছনের টেবিল থেকে উঠে আসা আলাপচারিতা কানে লাগল হঠাৎ। একজন বলছিল, ‘ক্যারিয়ার সাজাতে গিয়ে মনের অজান্তেই সাধারণ জীবন থেকে কেমন করে জানি অনেকটা দূরে সরে এসেছি।’ অন্য একজনের কারণ জানতে চাওয়ার উত্তর হিসেবে সে বলল, ‘টিউশনির টাকা দিয়ে বাবাকে একটা ঘড়ি দিয়েছিলাম, বাবা ঘড়িটা দেখে বলল, “এই ঘড়ি কি তোর অবসরের সময়গুলো দেখাবে? তাহলে আমি সেই সময়গুলোয় ফোন করতাম।” ছেলের বিশ্ববিদ্যালয়জীবনের ব্যস্ততা কত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে ভাবা যায়!’ একটা লাইন ওই মুহূর্তে আমার জন্য একটা গল্প হয়ে গেল। তারপর ও রকম গল্পের টানেই হোক আর

অন্য কোনো কারণেই হোক, রোজ রোজ ক্যানটিনে যাওয়াটা অভ্যাসে এসে দাঁড়াল। ওই দিনটার গল্প কেমন করে যেন আমার অনেক কিছু বদলে দিল। ক্যানটিনে গড়ে ওঠা এমন গল্পগুলো হয়তো খুব সাধারণ, কিন্তু কারও কারও জন্য অসাধারণ। গল্প কি শুধু বইয়ের পাতায় পাওয়া যায়? ক্যানটিনের চার দেয়াল কখনো কখনো বানিয়ে ফেলে জীবনের কিছু গল্প। ছোট ছোট এমন কিছু গল্পই হঠাৎ করে চলার পথে চলে এসে অদ্‌ভুতভাবে আমাদের ক্ষণিকের জন্য থামিয়ে দিয়ে নতুন করে ভাবতে শেখায়। ক্যানটিনে কানে আসা ওই দুটো লাইন আমার কাছে অনেক বড় একটা গল্প। এই রকম গল্পগুলো যুগ যুগ ধরে রুয়েটের ক্যানটিনে বেঁচে থাকুক।

দ্বিতীয় বর্ষ, স্থাপত্য বিভাগ

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

আমাদের ‘কফি হাউস’

সুমাইয়া সাবা

ক্যাম্পাস শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে দিগন্তবিস্‌তৃত মাঠ, ছাত্রছাত্রীদের কোলাহল, গোল হয়ে গাছতলায় বসে আড্ডা দেওয়া, ক্যানটিনে বসে চা খাওয়া, বন্ধুর খাবারে ভাগ বসানো আর তুচ্ছ বিষয়ে গলা ফাটিয়ে ঝগড়ার দৃশ্য। স্কুল কিংবা কলেজের তুলনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসটি নিয়ে সবার মনেই থাকে অন্য রকম আকাঙ্ক্ষা। প্রিয় ক্যাম্পাস কেমন হবে, তা নিয়ে মনে বোনা হয় কতই–না স্বপ্ন। ব্যতিক্রম ছিলাম না আমিও।

মাঝেমধ্যে ভীষণ অভিমান হতো, কেন আমাদের ক্যাম্পাসটা অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নয়? কিন্তু যখন সাভারে কাটানোর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে, তখন এই কষ্ট ক্ষণিকের জন্য হলেও লাঘব হয়। কারণ, এখানে সাভার ক্যাম্পাসে আমি ‘সত্যিকার ক্যাম্পাস’–এর আনন্দ পেয়েছি। এখানে বলে রাখি, আমাদের ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ছাত্রছাত্রীদের একটি সেমিস্টার এই সাভার ক্যাম্পাসে করতে হয়।

সাভার বিরুলিয়া ব্রিজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে আমাদের এই আবাসিক ক্যাম্পাস। ছায়াঢাকা, শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত। এখানে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা দুটি করে ডরমিটরি আছে। আছে একাডেমিক ভবন ‘অন্বেষা’ ও ‘শাল্লা’। এ ছাড়া আছে পাঁচটি ডাইনিং। আমরা একসঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে যেকোনো একটা ডাইনিং থেকে খাবার খেতাম। একসঙ্গে খাবার খাওয়ার যে কী আনন্দ, তা বলে বোঝানো যাবে না।

ক্যাম্পাসের ভেতরে আমাদের সবার পছন্দের একটি জায়গা হলো ‘মূর্ছনা’। এটি অনেকটা মঞ্চের মতো। অনেকের সুখ–দুঃখের সাক্ষী এই জায়গাটি, যা ‘আবেগের মূর্ছনা’ নামে পরিচিত। এ ছাড়া এখানে আছে ‘আনন্দপুর’। আমাদের যত আনন্দ আর কষ্ট—সব যেন এখানে এসে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়ে বন্ধুর সান্ত্বনা পাওয়া আর সারা দিন ঘটে যাওয়া ঘটনা ভাগাভাগি করে নেওয়া চলত এখনেই। এখানেই দেওয়া হতো সকাল ও বিকেলের চা বিরতি। আড্ডার তালে কখনো কখনো এক কাপের জায়গায় দুই কাপ চা খাওয়া হতো, কখনোবা চা ঠান্ডা হয়ে পানি হতো। এখানে বসেই মান্না দের গাওয়া ‘কফি হাউস’ গানে আমরা নিজেদের খুঁজতাম।

ক্যাম্পাসের ভেতরে ছাত্রছাত্রীদের খেলার জন্য আছে ‘দুর্বার’ ও ‘দিগন্ত’ নামে দুটি মাঠ। ক্লাস শেষ করে মাঠের পাশে বেঞ্চিতে বসে থাকা, বন্ধুদের খেলায় উৎসাহ দেওয়ার দিনগুলো আর ফিরে পাওয়ার নয়। বৃষ্টির সময় মাঠগুলো পুকুর হয়ে যেত। বৃষ্টিতে ভেজা আর পুকুরের পানিতে দাপাদাপি করার মধ্যে অদ্‌ভুত আনন্দ আছে। আর সঙ্গে টিচারদের বকুনি তো আছেই। বাস্কেটবল কোর্টে বসে কাটানো সেই সময়গুলো আজ কেবলই স্মৃতি। আমি জানি, অন্যান্য ক্যাম্পাসের তুলনায় আমাদের ক্যাম্পাস হয়তো কিছুই না, কিন্তু যে পাখি ওড়ার আনন্দ পায়নি, সে যদি জীবনে একবার ওড়ার স্বাদ পায়—সেটিই তো তার জন্য জীবনে শ্রেষ্ঠ পাওয়া, তাই নয় কি?

সহশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এতিম শিশুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগও আমরা পেয়েছিলাম। এই মানুষগুলো অল্পতেই খুশি হয়। এ ছাড়া সব পেশার প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের জন্য একদিন ক্যাম্পাসের সব কাজ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এভাবে দেখতে দেখতে সেমিস্টার শেষ হয়। আমরা ফিরে আসি। ফিরে আসার সময় ‘মান্না দে’র গাওয়া গানটাই বারবার কানে বাজে—‘সেই সাতজন নেই আজ,

টেবিলটা তবু আছে সাতটা পেয়ালা আজও খালি নেই, একই সে বাগানে আজ এসেছে নতুন কুঁড়ি শুধু সেই সে দিনের মালি নেই।'

আমরা ঠিকই ফিরে এসেছি। কিন্তু প্রতি সেমিস্টারে নতুন ছাত্রছাত্রীদের পদচারণে মুখর হবে আমাদের প্রিয় ক্যাম্পাস।